ATMADEEP
An International Peer-Reviewed Bi-monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Volume-I, Issue-II, November, 2024, Page No. 274-280
Published by Uttarsuri, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.1.issue.02W.510

দেশভাগের গল্প: গল্পে দেশভাগ

ড. সর্বজিৎ দাস, *সহকারী অধ্যাপক, নিলামবাজার কলেজ, করিমগঞ্জ, আসাম, ভারত*

Received: 03.11.2024; Accepted: 15.11.2024; Available online: 30.11.2024
©2024 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

Theme of Partition and migration spans a vast expanse of Bengali literature, which portrays the poignant realities of division. Partition features extensively in the Bengali short stories of Assam, yet it forms a distinct tradition compared to other regions. Bengali short stories from here vividly capture the post-Partition situation and environment. This article will attempt to illustrate in this aspect.

Keywords: Partition, emigration (or exodus), refugees, uprooted, homeless (or dispossessed), and struggle for survival

ভারতের ইতিহাসের এক নয় ও মর্মন্তুদ ঘটনা হল দেশভাগ। এই অভিশাপের প্রায়শ্চিত্ত আজও করতে হচ্ছে বিপুল সংখ্যক ভারতবাসীকে। ব্রিটিশকে তাড়িয়ে ভারতবাসী তার স্বাধিকার প্রতিষ্ঠা করলো ঠিক, কিন্তু অন্যদিকে ঘটলো মাতৃভূমির অঙ্গচ্ছেদ। তাই ভারতের স্বাধীনতা কারো কাছে আনন্দের জয়ধ্বনি; কারো কাছে বিষাদের চাপাকান্না। যাইহোক, দেশবিভাজন সংঘটিত হওয়ার নেপথ্য কারণ বিশ্লেষণ করে থাকবেন সমাজবিজ্ঞানীরা। সাহিত্যকার সংশ্লিষ্ট ঘটনাকে উপজীব্য করে সৃষ্টি করেছেন এবং করছেনও নানা শ্রেণির শিল্পসৌধ। এই প্রেক্ষিতে ভারতের নানা অঞ্চলে, নানাভাষায় গড়ে উঠেছে দেশভাগের সাহিত্য। একই কথা আসামের ক্ষেত্রেও। এই প্রবন্ধের নির্দিষ্ট পরিধি আসাম এবং আসামের বাংলা গল্প। দেখা গেছে, এই অঞ্চলের দেশভাগ কেন্দ্রিক বাংলা গল্পের ভিত্তি রচিত হয়েছে ব্যক্তির বাস্তব ও স্বর্জিত অভিজ্ঞতার ওপর। আধেয় হিসেবে রয়েছে দেশভাগ পরবর্তী ঘটনারাজি। অতএব প্রতিপাদ্যের অভ্যন্তরে প্রবেশ করার আগে, বিভাজনের সূচনামুখ উল্লেখ করা দরকার।

আসামের বড় রকমের জটিলতা আর বিপন্নতাগুলোর প্রায় সবকটির উৎস হিসেবে দেশভাগকে চিহ্নিত করা হয়। তবে এর শেকড় অনেক গভীরে প্রোথিত। দেশভাগ কেন্দ্রিক বাংলা গল্পের প্রেক্ষাপট আলোচনায় বিষয়টি পরিষ্কার করা জরুরি। প্রসঙ্গত, পাঁচটি জেলা নিয়ে গঠিত প্রাচীন আহোম রাজ্যকে ১৮২৬ সালে ইয়াণ্ডাবু চুক্তির মাধ্যমে ব্রিটিশ অধিগ্রহণ করে। এদিকে ১৭৬৫ সালে শ্রীহট্টজেলা ব্রিটিশের অধিকারভুক্ত হয় এবং ১৮৭৪ সালে তৎকালীন বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি থেকে এই জেলাকে কেটে এনে রাজস্বের ঘাটতি মেটানোর জন্য স্বতন্ত্র রাজ্য আসামের সঙ্গে যুক্ত করা হয় (চৌধুরী: ২০০৭: ১২)। ইতিহাসের সত্যতায় এটাই প্রথম বঙ্গভঙ্গ এবং আসামের বাঙালি ও অবাঙালির পারস্পরিক বৈমাতৃসুলভ সম্পর্কের সূত্রপাত সেখানে থেকেই। আবার ১৯০৫-এ ঢাকাকে রাজধানী করে 'পূর্ববঙ্গ ও আসাম' প্রদেশ' নামের নতুন রাজ্য গঠিত হয় (মিশ্র:

২০০২: ০৯)। ১৯১১ সালে ১২ ডিসেম্বর বঙ্গভঙ্গ রদ হলে শ্রীহট্ট-কাছাড় সহ আসামকে পূর্বাবস্থায় ফেরানো হয় (চৌধুরী: ২০০৭: ৪৫)। স্বাধীনতার প্রাক্কালে শ্রীহট্টের অবস্থান নিয়ে ১৯৪৭-এর ৬ ও ৭ জুলাই গণভোট নামক প্রহসন করে শ্রীহট্টকে ঠেলে দেওয়া হয় পাকিস্তানে (বর্মন: ২০১২: ৬৪)। এতে ত্রিপুরার সঙ্গে ভারতের যোগাযোগের একমাত্র রাস্তাটি পাকিস্তানে চলে যায়। ফলে ১৯৪৭-এর ১৮ আগস্ট রেড ফ্লিকের প্রকাশিত রোয়েদাদে শ্রীহট্টজেলার অন্তর্গত করিমগঞ্জ মহকুমার বাঙালি প্রধান সাড়ে তিন থানাকে ভারতে এনে আসামের সঙ্গে আবার যুক্ত করা হয়। ১৯৪৭-এর ১৪ আগস্ট যে মাটিতে পাকিস্তানের পতাকা ওঠেছিল, সেখানেই ১৮ আগস্ট ভারতের পতাকা তোলা হয় এবং ২৬ আগস্ট পূর্ণ মর্যাদায় স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপন করা হয় (আহমদ: ২০১৩: ২৫৪)। আসামে সুদীর্ঘকালীন ঠেলাঠেলির এই আগুনে ঘৃতাহুতি দেয় দেশভাগ। দেশভাগের বলি উদ্বাস্তুদের আগমন আসামের জনবিন্যাস এবং তৎসংলগ্ন আর্থ-সামাজিক পরিবেশের ওপর চাপ সৃষ্টি করে। এরই কার্যকারণ সূত্রে আসামে সংঘটিত হয় 'আসাম আন্দোলন', 'আসাম চুক্তি', 'বঙাল খেদা আন্দোলন' ইত্যাদি। প্রচুর বাঙালির ঘর-বাড়ি জ্বালানো হয়; অনেকে প্রাণ বাঁচানোর জন্য জায়গা-জমি ছেড়ে নিরাপদ আশ্রয় খোঁজেন। অন্যদিকে সৃষ্টি হয় ১৯৬১, ১৯৭২, ১৯৮৬-এর ভাষা আন্দোলন। শহিদ হন চোদ্দ জন। উদ্ভাবিত হয় এনআরসি, ডিটেনশন ক্যাম্প, ডি-ভোটার প্রভৃতি। বিভাজন কেন্দ্রিক আসামের বাংলা গল্পের পশ্চাৎপট এগুলোই। সেজন্য এই অঞ্চলের দেশভাগ ভিত্তিক বাংলা গল্পে ভাগ কম, ফল বেশি দেখা যায়।

(২)

দেশভাগের ফলে দেশত্যাগের করুণ চিত্র ইতিহাসে লিপিবদ্ধ রয়েছে। স্বদেশ ত্যাগ করে স্বস্তি ও নিরাপদ স্থান মনে করে যাঁরা আসামে এসে ওঠেছিলেন, তাঁদের সম্মুখে উপস্থিত হল আরও জটিল সমস্যা। জীবন নাথের (১৯৩৯) 'ডি-ডি' (পুরকায়স্থ : ২০১৮) গল্পে বিষয়গুলো বর্ণিত। দেশভাগের ফলে জাতিগত বিদ্বেষবহ্নি গ্রাস করেছিল গল্পে বর্ণিত বিজনবাবুর পরিবারকে। প্রতিবেশী আব্দুল্লার সাহচর্যে তিনি তাঁর বিধবা কন্যা কল্যাণবতী, পুত্রবধূ আশালতা ও নাতিকে নিয়ে, মুসলিমদের বস্ত্র পরিধান করে, রাতের অন্ধকারে আসামে এসে আশ্রয় নেন। বিদায় জানানোর সময় আব্দুল্লা তাদের আগাম সতর্ক করে বলে— 'দেশের ছাট্টিকেট কিন্যা লইও। না অইলে ডিডি অইবা গা' (পৃ:৮৯)। 'ডিডি' মানে ডিটেকশন, ডি-ভোটার, ডিপোরটেশন ও ডিটেনশন ক্যাম্প। বাঙালির জাতীয় ইতিহাসে গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায় যেমন রয়েছে, তেমনি এমন অগুনতি অধ্যায় রয়েছে যেগুলো প্রতারণা, লাঞ্ছনা, প্রহার, নির্যাতন, নির্বাসন, অপমান, হতাশা ও রক্তক্ষরণের দলিল। উক্ত ইংরেজি শব্দের আদ্যক্ষর বাঙালির এই দুর্দশাকে সংকেতিত করে। আব্দুল্লার উচ্চারিত সতর্কবাণী পরবর্তীকালে বিজনবাবুর জীবনে সত্যরূপে প্রতিপন্ন হয়। ভারতীয় নাগরিকত্বের উপযুক্ত প্রমাণের অভাব তাঁকে সারাজীবন সন্ত্রস্ত করে রাখে। বহিরাগত ও ভূমিপুত্রের রাজনৈতিক দ্বন্দ্বের শিকার আসামের বহু সংখ্যক বাঙালি, বিজন এসবের প্রতীকী চরিত্র। লাঞ্ছিত, নির্যাতীত বিজনের মুখে তাই শোনা যায়—'হা বগমান, বাঙালের মাতা গোজার ঠাই পিথিমির কোনখেনে নাই' (পৃ-৯০)। আসামের বাঙালির দুরবস্থার ছবিটি সকরুণ করে তোলে গল্পকারের একটি উক্তি— "স্থানীয় সভা-সমিতিতে বাঙালিরাই তো 'বহিরাগত'। স্রেফ একটি নিন্দাসূচক শব্দ, একটি ছিন্নমূল জাতিকে অনেক নীচে নামিয়ে দিতে পারে। তার নিদর্শন ইহুদি। তারপর বাঙালি" (পৃ ৯১)।

ভারতের নাগরিক হিসেবে নিজেকে প্রমাণ করতে না পারলে পুলিশ সদলবলে এসে ধরে নিয়ে ডিটেনশন ক্যাম্প-এ ভরে দেয়। গল্পকার কুমার অজিত দত্তের (১৯৫০) গল্প 'অজানা পথে'র মাধবকে বৃদ্ধা মা, পোয়াতি স্ত্রী ও কন্যা সমেত সেই নরককুণ্ডে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। মাধব সবজি বিক্রি করে সংসার চালায়।

নাগরিকত্বের প্রমাণ চেয়ে ধরাধরি শুরু হলে তাকেও তলব করা হয়। সে তার অতীতের বিভিন্ন তথ্য মৌখিকভাবে তুলে ধরে। কিন্তু তা গ্রহণযোগ্য নয়— 'কিন্তু কিভাবে বিশ্বাস করব খুড়ো, আপনি তো ইণ্ডিয়ার কোনো ডকুমেন্ট দেখাতে পারেননি।' (পুরকায়স্থ:২০১৮:৭০)। ফলে যা হওয়ার কথা তা-ই হল। সপরিবার মাধবকে রাতের অন্ধকারে নির্জন জঙ্গলে অবস্থিত ডিটেনশন ক্যাম্পে পুরে দেওয়া হল। ওপারে অত্যাচারিত হয়ে জন্মভিটে থেকে আসামের অজানা পথে সে পা বাড়িয়েছিল প্রথমবার। এবার দ্বিতীয়বারের মতো সে অজানা পথে পাড়ি দিচ্ছে। তার দুর্ভোগের কাহিনি এখানেই শেষ নয়। ক্যাম্পে প্রহরারত পুলিশ রাতের অন্ধকার ও নির্জনতার সুযোগ নিয়ে তার স্ত্রীর ওপর হামলে পড়ে। দেশভাগের বলিচ্ছেদ তার স্ত্রীর সম্ভ্রম নষ্ট করতে চায়। কৌশলে দুর্বৃত্তের অঙ্গহানি ঘটিয়ে তারা সেখান থেকে পালিয়ে তৃতীয়বারের মতো অজানা পথের পথিক হয়। এবার তারা ভাসমান নাগরিক। নথিপত্রের প্রেতচ্ছায়া তাদেরকে স্থায়ী বসত গড়তে দেয় না।

আসাম বন্যা কবলিত রাজ্য ফিবছরের বন্যায় সমস্ত কিছুর সঙ্গে অনেকের ভাসিয়ে নিয়ে যায় অতীতের দলিল দস্তাবেজ। ফলে ভারতীয় হওয়া সত্ত্বেও নথিহারাদের তা প্রমাণ করতে নাস্তানাবুদ হতে হয়, বিশেষ করে দরিদ্রশ্রেণির মানুষকে। দেবব্রত চৌধুরীর (১৯৬১) 'আব্বাজানের হাড়: একটি প্রামাণ্য দলিল' (চৌধুরী: ২০১৬) গল্পের রিক্সা চালক আমিরুদ্দি এরকম নাজেহাল হয়। ১৯৫১ সালে তার বাবা আসামের সাধারণ নির্বাচনে ভোটও দিয়েছিলেন। এসমস্ত নথি বন্যার জলে তলিয়ে গিয়েছে। আচমকা একদিন একটি নোটিশ সে পায়— "যদিও ভোটার তালিকায় (১৯৮৯) আপনার/আপনার পরিবারের নাম অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, তবুও আপনি কিংবা আপনার পরিবারকে ভারতীয় নাগরিক বলে সন্দেহ প্রকাশ করা হচ্ছে" (পৃ: ১১৬)। এরকম একটি সমনে আমিরুদ্দির পায়ের তলার মাটি সরে যেতে যেতে শূন্য গহ্বরের সৃষ্টি করে। বিদেশির নোটিশ তার পরিচিত অনেকেই পেয়েছিল, এতে সে কর্ণপাত করেনি, বরং এমন ঘটনা তার ক্ষেত্রে ঘটবে না বলে নিশ্চিত ছিল, কারণ সে ভারতীয়। সমন থেকে বাঁচার উপায়ান্তর না পেয়ে সে উকিলের দ্বারস্থ হয়। সেক্ষেত্রে অনেক টাকার প্রয়োজন। সামর্থহীন আমিরুদ্দির পক্ষে তা জোগাড় করা সম্পূর্ণ অসম্ভব। পরিস্থিতির বেড়াজালে সে অবৈধ পথে উপার্জন করতে বাধ্য হয়। মানুষের হাড়গোড়, কঙ্কাল সংগ্রহ করে ভারত-বাংলার সীমান্তে চালান দেওয়ার কাজ। বিনিময়ে থাকছে পর্যাপ্ত নগদ টাকা হাতে আসার সুযোগ। অসহায় আমিরুদ্দি প্রতিশ্রুত দিনক্ষণের মধ্যে কোথাও কারও হাড়গোড় না-পেয়ে, অবশেষে কবর খুঁড়ে পিতার কঙ্কাল তুলতে উদ্যত হয়— "মধ্যরাতে তাই আব্বাজান বদরুদ্দিকে গোর থেকে টেনে তুলল আমিরুদ্দি। এক পলাতক আসামিকে গ্রেপ্তার করার মতো। মাটির তলায় সাত বছর ফেরারি জীবন কাটিয়ে আব্বাজান এখন শুধু হাড়ের কাঠামো" (পৃ-১২৫)। নাগরিকত্বের জুজু থেকে মৃত্যুও কাউকে বাঁচাতে পারছে না। সন্তানকে ভারতীয় হিসেবে প্রমাণ করার জন্য মৃত পিতাকে কবর থেকে ওঠে আসতে হয়। নাগরিকত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য এরকম নাস্তানাবুদ হওয়ার নজির আসাম ব্যতীত অন্যত্র রয়েছে কিনা, তা আমাদের অজ্ঞাত।

অরিজিৎ চৌধুরীর (১৯৫০) 'যাযাবর' (পুরকায়স্থ: ২০১৮) গল্পে পুনরায় ভিটে বদল করার প্রসঙ্গ পাওয়া যায়। গল্পকার নিজেই দেশভাগের বলি হয়ে আসামের করিমগঞ্জে আসেন এবং পরবর্তীকালে কলকাতায় চলে যান। গল্পের নিখিলেশ নাগরিকত্বের ঝুটঝামেলায় ভীত হয়ে কলকাতায় চলে যাবে স্থির করে। সে জানতে পারে, "একান্ন সালের এনআরসি-তে কিংবা একাত্তর সালের আগের ভোটার তালিকায় যাদের পূর্বপুরুষের নাম নেই, তাদের সবাইকে এ দেশ থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হবে" (পৃ: ২৯)। তার পিতা স্বাধীন আসামের প্রথম সাধারণ নির্বাচনে ভোট দিয়েছিলেন, কিন্তু এর প্রমাণ তার কাছে নেই। নাগরিকত্বের প্রামাণ্য হিসেবে ১৯৬৬ সালের ভোটার তালিকাকে আপাত গণ্য করা হয়। কিন্তু সেখানে তার বাবার নামের বানান ভুল করে মুদ্রিত। তাছাড়া আরেকটি ভীতি অনেকের মনে জাগরূক থাকে, তা হল নতুন করে কাঁটাতারের বেড়া

বসানোর জন্য জরিপ করা সীমারেখা। আসামের করিমগঞ্জ জেলায় ১০৪ কিলোমিটারের অধিক নদী ও জল সীমান্ত রয়েছে। সীমান্ত সুরক্ষায় রয়েছে কাঁটাতারের বেড়া। কোথাও কোথাও বেড়াগুলো এমনভাবে গিয়েছে, যেখানে কারও বাড়ির মূল অংশ ভারতে আর বিচরণ ক্ষেত্র পড়েছে বাংলাদেশে। ফলে প্রতিদিন রাতে বেড়ার বাইরে থাকা লোকেরা ভারতের নাগরিকত্ব হারিয়ে ফেলেন। কারণ কাঁটাতারের বেড়ার সঙ্গে থাকা গেটগুলো সন্ধ্যার পর বন্ধ করে দেওয়া হয় (দৈনিক যুগশঙ্খ: ৩-৯-২৩: পৃ-০৯)। এমন ঘটনা নিখিলেশকে আরও সন্ত্রস্ত করে তোলে। সে শুনেছে "করিমগঞ্জ জেলারই জারাপাতা, জাফাসাইল, এসব গ্রামে কাঁটাতারের বেড়া আছে। শুনেছি কাঁটাতারের বেড়ার ওপারে এমন কোনও কোনও বাড়ি আছে যেখানে বাড়ির কিচেন বাংলাদেশে, বেডরুম ইণ্ডিয়ায়" (পৃ-৩৫)। এ সমস্ত কারণে এবং সন্তানের ভবিষ্যৎ চিন্তা করে সে কলকাতায় পাড়ি দেয়। দেশভাগের এরূপ ভাগফল সারাজীবন বহন করতে হয় অনেককে। নিখিলেশ নিমিত্ত মাত্র।

অরিজিৎ চৌধুরীর নিখিলেশ কলকাতা চলে যায়, এদিকে মিথিলেশ ভট্টাচার্য (১৯৪৬) রচিত 'স্বপ্নলোক' (নন্দি: ২০২১) গল্পের জবা আসামে ফিরতে চায় না ওই একই কারণে। জবার স্বামী নীলাঞ্জনের পূর্বপুরুষ দেশভাগের শিকার। নীলাঞ্জনের জন্মস্থান আসামের শিলচর এবং সেইসূত্রে শহরটি তার স্বপ্নলোক। কর্মসূত্রে সে মুম্বাই নিবাসী। সে তার স্বপ্নলোকে ফিরতে চায়। মহানাগরিক জীবনে সে অতিষ্ঠ। তাছাড়া কেবল বাঙালি হওয়ায় সেখানে সে বার বার হেয় প্রতিপন্ন হয়। তার অন্তর্বেদনা বোঝা যায় একজন পরিচিতের সঙ্গে বার্তালাপে— "আসলে কী জানেন, আপনারা আমাদের বাংলার মানুষ বলে ভাবেন না। বাংলা ভাষার জন্যে রবীন্দ্র শতবর্ষে বুকের রক্ত ঝরিয়ে আমরা সৃষ্টি করেছিলাম অমর ১৯ শে মে, দিনটি আপনাদের কাছে তেমন স্বীকৃতি পেল না, এটা বাঙালি মাত্রেরই দুর্ভাগ্য" (পৃ-৩১৫)। ভাষার নামে উগ্রজাতীয়তাবাদের প্রতিবাদে ১৯৬১ সালের ১৯ মে শিলচরে এগারোজন শহিদ হন (লস্কর: ২০২১: ২৯)। এঁদের একজন কমলা ভট্টাচার্য; তিনি মাতৃভাষা রক্ষার্থে শহিদ হওয়া পৃথিবীর সর্বপ্রথম মহিলা। গল্পের নীলাঞ্জনের রক্তে বাঙালিত্বের স্বাভিমান প্রবাহিত। কিন্তু তার স্ত্রী এক্ষেত্রে উদাসিনী। একটিই ভয় স্ত্রীকে সর্বক্ষণ তাড়া করে, তাহল, "ওখানে কত কত প্রকৃত ভারতীয়কে হ্যারাস করছে। ডি-ভোটার বানিয়ে ডিটেনশন ক্যাম্পে ভরে তারপর রাতের অন্ধকারে বর্ডারে নিয়ে গিয়ে বাংলাদেশে ঠেলে দিচ্ছে" (পৃ-৩১৮)। রাজনীতি-সমাজনীতির অনিবার্য বাস্তবতার সামনে অপসৃত না-হয়ে, নিজের অস্তিত্বকে সপ্রমাণ করার ব্রত রয়েছে অনেক বাঙালির। নীলাঞ্জন তাদের প্রতিনিধি। তাই সে তার স্বপ্নলোকে প্রত্যাবর্তন করে।

(৩)

ভূমিপুত্র আর বহিরাগত দ্বন্দ্ব আসামের সার্বিক পরিবেশকে মেঘাচ্ছন্ন করে রাখে। দেশভাগের অনিবার্য পরিণামে আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকায় বাঙালিদের প্রব্রজন ঐতিহাসিক সত্য। উদ্বাস্তুর আগমন আদিবাসীদের নানাবিধ ভীতির সঞ্চার ঘটিয়েছে। অস্তিত্ব বিপন্ন হওয়ার ভয় এদের মধ্যে প্রবল। এরই পরিণামে আসামে ১৯৭৯ তে সংঘটিত হয় 'বঙাল খেদা আন্দোলন'। নারীচেতনাবাদী সাহিত্যকার অনুরূপা বিশ্বাস তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন, 'সবে একটু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলছি, এর মধ্যে শুরু হয়ে গেল আসামে কুখ্যাত 'বঙ্গাল খেদা' আন্দোলন। উগ্র জাত্যাভিমানী এই অভিযানের নৃশংসতায়, হিংস্রতার বিষবাষ্পে হাজার হাজার বাংলাভাষী মানুষ নির্বিচারে বিতাড়িত, লুণ্ঠিত হতে থাকল— তাদের ঘরবাড়ি পুড়ে ছারখার করে দেওয়া হলো। তখন সর্বস্বান্ত অগণিত শরণার্থী বাঁচার তাগিদে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা ছেড়ে নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে ট্রেন বোঝাই হয়ে এলো কাছাড়ে, বরাক উপত্যকায়। শিলচর নর্মাল স্কুল ছাত্রাবাস, অধর চাঁদ হাইস্কুল সরকারী বালক ও বালিকা বিদ্যালয়, কোর্টের বারান্দা, নরসিং স্কুল— সব জায়গা ভরে গেল দুর্গতদের ভিড়ে' (বিশ্বাস: ২০০৭: ৫৬)। শ্যামলেন্দু চক্রবর্তীর 'আশ্রয়' (নন্দি: ২০২১) গল্পের জনৈক বৃদ্ধ এই আন্দোলনের পরোক্ষ

শিকার। 'গ্রাম ছাড়ো, তুমি বাইরের মানুষ, এ মাটির কেউ নও' (পৃ- ২৬২)— এরকম ধমকে বৃদ্ধের হৃদপিণ্ড নিষ্ক্রিয় হওয়ার উপক্রম হয়। দেশভাগের পরিণতিতে পরিবার নিয়ে একবস্ত্রে এসে আসামে আশ্রয় নিয়েছিলেন তিনি। এসেছিলেন ধর্মের তাড়া খেয়ে। এবার ভাষিক পরিচয়ে হয়ে ওঠলেন স্থানীয়দের বৈরী। তাঁর 'প্রথমবার নাড়ি ছিন্ন করেছিল ধর্ম, দ্বিতীয়বার করল ভাষা' (পৃ-২৬৩)। ছিন্নমূল বাঙালির আশ্রয় খোঁজার দৌড়ঝাঁপ সমাপ্ত হওয়ার ফুরসত বোধহয় নেই। একই বাস্তবতার শিকার সন্তোষ বিশ্বাস, যিনি অভিজিৎ চক্রবর্তীর (১৯৭৫) 'সন্তোষ বিশ্বাসের গল্প'-এর (পুরকায়স্থ: ২০১৮) মূল কথক। দেশীয়, ধর্মীয় ও ভাষিক কোনও পরিচয়ে সন্তোষ নিজের অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠা করতে পারেননি। নিজের বয়ানে তিনি 'আচালা মানুষ'। "আচালা হল, ধরো এমন এক গাছ যার বীজ কেউ কোনোদিন বপন করেনি। কেউ যত্ন করেনি। আপনা আপনি বড় হওয়া গাছ" (পৃ-০৬)। ১৯৩০ সালে ময়মনসিং জেলায় জন্ম নেওয়া সন্তোষ আসামে আশ্রয় নেন ১৯৫৭ সালে। অসমিয়ার আক্রমণে এক সময় তাঁকে পাটখেতে লুকিয়ে আত্মরক্ষা করতে হয়। জ্বালিয়ে দেওয়া হয় তাঁর ঘরবাড়ি। এদিক শান্ত হতে না হতেই বোড়ো জনগোষ্ঠী উগ্রতায় চেতিয়ে ওঠে। "গভীর রাতে সশস্ত্র বোড়ো যুবকরা যাতায়াত করে। পুলিশ টহল দেয়। এখানে ওখানে বোমা ফাটে। ট্রেন উড়ে গেল গোরেশ্বরে" (পৃ- ০৮)। মাটির পরিচয়ে মানুষের ঠিকানা চিহ্নিত হয়। ভূগোলের নির্ধারিত সূচকে মানুষের অস্তিত্ব নির্মিত ও অভিজ্ঞাত হওয়ার কথা। সন্তোষেরও হয়েছিল। কিন্তু এদেশে ও ওদেশে তাঁর বাস্তুভিটার ওপর বারবার ব্যবচ্ছেদ ঘটায় তিনি 'আমিত্বহীন' প্রাণী হয়ে ওঠেন। এরই অনুরণন শোনা যায় তাঁর বয়ানে— "কে আমি? কার আমি? আমি পাকিস্তানের কেউ নই, বাংলাদেশের কেউ নই, ইণ্ডিয়ারও কেউ নই। আমার নিজের কোনও ভাষা নেই। শুদ্ধ বাংলা মুখে আসে না। অসমিয়া বললে সুরে লাগে না। ময়মনসিংহের ভাষাটা জগাখিচুড়ি হয়ে গেছে।... আমি বাঙালির কেউ হতে পারলাম না, অসমিয়ার কেউ হতে পারলাম না, বোড়োদেরও কেউ হতে পারব না জানি" (পৃ-১৫)। এই কঠোর বাস্তবোচিত আত্ম-উক্তির জবাব নেই। দেশভাগের শাণিত ক্ষুর চেঁছে দিয়েছে সকল উত্তর।

সন্তোষ বিশ্বাস বাস্তুভিটে খুইয়ে যেমন পরিচয়হীন হয়েছেন, তেমনি দেবীপ্রসাদ সিংহের (১৯৫৪) অনন্ত "উড়ে এসে জুড়ে বসা'র অপবাদে অস্তিত্বহীন হয় এবং তার স্থান ঘটে 'নো ম্যানস ল্যাণ্ড'-এ। দেবীপ্রসাদের 'সীমান্তের ওপরে থমকে থাকা পা" (পুরকায়স্থ: ২০১৮) গল্পের অনন্তও দেশভাগের অভিশপ্ত এবং আসামের বিচ্ছিন্নতাবাদীর উৎপীড়নের বলি। সাহিত্যতাত্ত্বিক তপোধীর ভট্টাচার্য মন্তব্য করেন, "রাষ্ট্রশক্তির নির্মম সন্ত্রাস–চক্রান্ত-বিদ্বেষ-আক্রোশ-তাড়িত বাঙালির অবস্থান যে ইতিহাসের সূত্রেই ভারত নামক ধারণায় সম্পৃক্ত, তা ভুলিয়ে দিয়ে এই জাতিকে 'উড়ে এসে জুড়ে বসা এক আপদ' হিসেবে সর্বত্র ঘৃণিত করে তোলা হচ্ছে প্রকাশ্যে" (নন্দি: ২০১১: ৩৪)। অনন্ত "ঘৃণিত, লাথি খাওয়া একটি জীব" (পৃ- ১৬০)। তার মাথার ওপরে কেবল আকাশ, আর পায়ের তলায় রয়েছে একমাত্র একখণ্ড মাটি। এই মাটির মালিক কে, তা কেউ জানে না। অনন্ত নিজেও জানে না।

তাছাড়া মলয়কান্তি দে'র 'টান্টুপিরের মাগুর মাছ', আশরাফ আলির স্বদেশ; বিজয়া দেবের 'যাত্রাপথে'; হিমাশিস ভট্টাচার্যের 'ডি-ভোটার'; পরিতোষ তালুকদারের 'করিমউদ্দিনের স্বপ্নবিলাস'; রূপরাজ ভট্টাচার্যের 'মান্দাস'; শঙ্কু চক্রবর্তীর 'যজ্ঞেশ্বর অথবা রিফিউজিলতার গল্প'; আদিমা মজুমদারের 'উইপোকার ঘরবাড়ি'; বিশ্বরাজ ভট্টাচার্যের 'রেডিয়ো'; রণবীর পুরকায়স্থের 'স্বপ্নস্বত্ত্ব'; শেখর দাশের 'জনসভা'; উষারঞ্জন ভট্টাচার্যের 'রিফিউজিলতা' প্রভৃতি আসামের দেশভাগ কেন্দ্রিক উল্লেখযোগ্য বাংলা গল্প। উল্লিখিত গল্পকার অনেকেই দেশভাগের প্রত্যক্ষ শিকার, অনেকের পূর্বপুরুষ দেশ হারিয়ে আসামে এসে ঘর বেঁধেছেন।

(৪)

আসামের দেশভাগ ভিত্তিক বাংলা গল্পে দেশভাগ থেকে সম্ভূত দেশভাগ-উত্তর সমস্যাবলি প্রধান হয়ে ওঠেছে। তবে দেশত্যাগের যন্ত্রণা, ফেলে আসা জন্মভূমির প্রতি অয়স্কান্ত আকর্ষণ, পালিয়ে আসার পথ-বৃত্তান্ত ও তৎকালীন সময়ে অত্যাচারিত হওয়ার বিবরণ ইত্যাদি প্রসঙ্গ বিরল নয়। একথা সর্বজনবিদিত, দেশভাগ শুধু রাজনৈতিক বা ভৌগোলিক মানচিত্রের বিভাজন ঘটায়নি, সমাজ-সংস্কৃতি, সম্প্রীতি-প্রগতি-ঐক্যের মধ্যেও ভাঙন ধরিয়েছে। ফলস্বরূপ উন্মেষ ঘটেছে দিকভ্রান্ত বিপন্নতার। এই বিপন্নতাকে অসমিয়া-বাঙালি তাদের নিজস্ব দৃষ্টিকোণ থেকে অবলোকন করেন। বস্তুত, দেশভাগকে আসামের বাঙালিরা যেভাবে অনুভব করেন, অসমিয়ারা তা দেখেন অন্যভাবে। দেশভাগের ফলে সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের প্রত্যক্ষ প্রভাব যেভাবে বাঙালি জীবনকে বিপর্যস্ত করে তুলেছিল, অসমিয়া সমাজজীবনে সেরকম কোনও ঘটনা ঘটেনি। বাঙালিদের মতো অসমিয়াদের যথাসর্বস্ব বিলিয়ে দিয়ে পূর্বপুরুষের ভিটে ছেড়ে চলে আসতে হয়নি। তাই বাস্তুভিটা ত্যাগের যে-বেদনা এবং অস্তিত্ব সংকটের দহন, তা অসমিয়া সাহিত্যে সেভাবে প্রতিফলিত হতে দেখা যায় না (নন্দি: ২০২১: ৭৭)। তবে একেবারে নেই বললে সত্যের অপলাপ হয়। অসমিয়া সাহিত্যকার হোমেন বরগোহাঞির 'ইসমাইল শেখর সন্ধানত' (ইসমাইল শেখের সন্ধানে); জেহিরুল হোসেইনের 'ভাল মানুহর সংজ্ঞা' (ভালো মানুষের সংজ্ঞা); প্রশান্ত কুমার দাসের 'কাহিনির বাবে' (কাহিনির জন্য); বিপুল খাটনিয়ারের 'সীমান্ত পথর গল্প' (নন্দি: ২০২১) প্রভৃতি দেশভাগের প্রেক্ষাপটে রচিত উল্লেখযোগ্য অসমিয়া গল্প। তবে নতুন জায়গায়, নতুন পরিবেশে, নতুন করে বসতি স্থাপন করার সময় প্রতিদিন-প্রতিনিয়ত বাঙালি যে-ভাবে নানাবিধ অপমান-অত্যাচারের সম্মুখীন হয়েছিল এবং যার রেশ অদ্যাবধি অনুরণিত, অসমিয়ার ক্ষেত্রে সেসব ঘটেনি। সেজন্য আসামের অসমিয়া গল্পে এসবের প্রতিফলন অনুপস্থিত।

প্রকৃতপক্ষে দেশভাগ একটি চলমান প্রক্রিয়া, অন্তত আসামের প্রেক্ষাপটে। দেশভাগ থেকে সমুদ্ভূত দহন-যন্ত্রণা ও বিপন্নতার ধারাবাহিকতা আসামে এখনও বহাল। একদিকে জনবিন্যাসের পরিবর্তনহেতু স্থানীয় কৃষিখেত-জুমখেতের ওপর ফলিত প্রভাব, পাহাড়-টিলা-সমতল ভূমির দখলদারিত্ব নিয়ে চলিত সংঘর্ষ, ব্যবসা-বাণিজ্য-চাকরিতে ক্রমবর্ধমান প্রতিদ্বন্দ্বিতা, অস্তিত্বের স্বাতন্ত্র্য রক্ষার সংকট ইত্যাদি; অন্যদিকে এনআরসি নিয়ে সমস্যা, ডি-ভোটারের মাধ্যমে হয়রানি, বিদেশি সন্দেহের নোটিশ, বিনা প্রমাণে ডিটেনশন ক্যাম্পে বন্দি করা, ঘরবাড়ি ভেঙে উচ্ছেদ-উৎখাত করা, আধার কার্ড বানাতে বঞ্চনা করা, ডিলিমিটেশন করে বিধানসভার আসন সংখ্যা হ্রাস করা ইত্যাদি আরও অনেক সমস্যা, যা প্রতিনিয়ত ক্রিয়াশীল এখানে। এসবের বীজ দেশভাগে উপ্ত এবং এর দায় দেশভাগের ওপরই বর্তায়। তবে বাঙালি-অসমিয়ার বৈমাতৃসুলভ সম্পর্কের শেকড় ঔপনিবেশিক ভারতের প্রকোষ্ঠে প্রোথিত। দেশভাগ এই সম্পর্ককে আরও বিষিয়ে তুলেছে। ধর্মীয় পরিচিতির দায়ে দেশ ত্যাগ করতে যারা বাধ্য হয়েছিলেন এবং আসামে এসে নীড় বেঁধেছিলেন, ভাষিক পরিচিতির দায়ে তারাই এখানে আবার বিপন্নতার মুখোমুখি হলেন। আসামের গল্পে এসবের প্রতিফলন লক্ষণীয়।

সুতরাং দেশভাগ সমাধান নয়, সমস্যার উপক্রন্তা। দেশভাগ দেয়নি কিছুই, ছিনিয়েছে অনেক। তাই সাতচল্লিশের স্বাধীনতা-প্রাপ্তি যার কাছে প্রসন্নতার, অন্যের কাছে তা বিপন্নতার এবং দেশভাগপ্রসূত বিষণ্ণতার।

তথ্যসূত্র:

১। চৌধুরী, সুজিৎ (২০০৭)। বরাক উপত্যকার সমাজ ও রাজনীতি। যুগশক্তি প্রকাশন, করিমগঞ্জ।
২। মিশ্র, বাণীপ্রসন্ন (২০২২)। ভূমিপুত্রের অনুসন্ধান। শিলচর সানগ্রাফিক্স, শিলচর।
৩। বর্মন, প্রসূন (সম্পাদিত, ২০১২)। নাইনথ কলাম। গুয়াহাটি, অসম।
৪। আহমদ, কামালুদ্দিন (২০১৩)। করিমগঞ্জের ইতিহাস। নতুন দিগন্ত প্রকাশনী, কাছাড়, আসাম।
৫। পুরকায়স্থ, রণবীর (সম্পাদনা, ২০১৮)। আসামের বাংলা ছোটগল্প। একুশশতক, কলকাতা।
৬। চৌধুরী, দেবব্রত (২০১৬)। আব্বাজানের হাড়। সৃজন গ্রাফিক্স অ্যান্ড পাবলিশিং হাউস, শিলচর।
৭। নন্দি, কান্তারভূষণ (সম্পাদিত, ২০২১)। যাপনকথা। প্রাগজ্যোতিষ নগর, গুয়াহাটি।
৮। বিশ্বাস, অনুরূপা (২০০৭)। নানা রঙের দিন। বরাক নন্দিনী প্রকাশনী, শিলচর।
৯। লস্কর, দিলীপকান্তি (২০২১)। শহিদতীর্থ বরাক। লালন মঞ্চ প্রকাশনী, করিমগঞ্জ, আসাম।